অপেক্ষা

ফাহমিদা চৌধূরী

তাম্রলিপি

উৎসর্গ

জীবনে অপেক্ষারও যে আলাদা মাধুর্য আছে তা কেবল সেই জানে, যে তার প্রিয়জনের জন্য কখনো না কখনো অপেক্ষায় থেকেছে। অপেক্ষার অন্য নামই যে জীবন, অপেক্ষার অন্য নামই যে ভালোবাসা, অপেক্ষা করতে করতেই এক সময় মানুষ তা বুঝতে পারে।

প্রতিটি মানুষের জীবনের সেই দুরন্ত চাওয়া, যা আজো না পাওয়াই রয়ে গেছে, তার জন্য তৃষ্ণার্ত হৃদয় আজো অপেক্ষায় রয়েছে, তাকেই উৎসর্গ আমার এই লেখা। তার কোনো একটি নাম নেই। নেই আলাদা কোনো পরিচয়।

ভূমিকা

হঠাৎই বুকের মধ্যে একটা চিন চিন ব্যথা, একটা অস্বস্থি, তারপর হাহাকার। আমি বসে বসে ভাবছি এই অনুভূতির নাম কি? ভাবতে ভাবতেই হাতে তুলে নিলাম কলম। আমার লেখায় তমা হয়ে উঠলো জীবন্ত। ক্রমশই তমালিকার ভেতরের অতৃপ্তি আর না পাওয়া আমাকে ভাবিয়ে তুলল। কারণ, আক্ষরিক অর্থে তমার অভাব বলতে কিছু নেই, না পাওয়া বলতেও কিছু নেই। তবুও সে যেন ডুবে আছে এক না পাওয়ার সাগরে।

এত মানুষের ভীরে মানুষ পাওয়াই দুষ্কর। চারিদিকে দেখি কেবল যন্ত্রের ছরাছড়ি। আমরা সবাই যেন যন্ত্র হয়ে উঠেছি ক্রমশ, আমাদের প্রত্যহের কাজ আমরা করি মেশিনের মতো। কখনো কোনো একদিন, আমাদের মাথায় প্রোগ্রাম সেট করা হয়েছিল, ব্যাস সেই থেকে আমাদের যাত্রা শুরু। পথ চলতে চলতে আমরা ভুলে গেছি আমাদের অতীত, আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের গন্তব্য।

আমরা জানি না ব্যর্থতা কাকে বলে, সাফল্যের মানেই বা কি? সব কিছু বুঝতে চাই যুক্তি দিয়ে। আমরা ভুলে যাই মানুষের মস্তিস্ক যেমন আছে তেমনি আছে একটি মন। যুক্তি যা বলে মন তাতে সায় দেয় না, আবার মন যা বলে মস্তিস্ক তা মেনে নিতে পারে না।

আমাদের চারপাশে যুক্তি নির্ভর বিচ্ছিন্ন মানুষগুলো মিলে মিশে তৈরি করেছে এক উন্নত আপার ক্লাস সমাজ। সেই সমাজের সবাই চলে তাদের নিজেদের বানানো নিয়মে, তাদের মনের ভেতরের অমিমাংসিত সত্যকে ঢাকার জন্য তারা ব্যাবহার করে সাদা চাদর। যার নিচে ঢাকা পরে যায় জীবনের নানান ক্ষত। তারা হয়ে উঠে নির্মল। চোখে আটে রঙিন চশমা। তা দিয়ে যা-ই দেখা যায় তাই তাদের ভালো লাগতে শুরু করে।

কিন্তু এখানেই জীবনের এই অধ্যের শেষ নয়। মানুষের মন এক সময় হয়ে ওঠে প্রতিবাদি। সে তখন আর মিথ্যা কে দেখতে চায় না। সে তখন আর জীবনকে যন্ত্রের মতো চালাতে চায় না। সে চায় তার আসল রূপ দেখতে, সে চায় তার সত্যি কারের ভালোবাসার হাত ধরতে, সে চায় তার নিজের কাছে সত্য কথাটি বলতে।

সেই রকম এক পরিস্থিতিতে আমি ধরেছি তমার হাত। শুভ হয়ে আমি নিয়ে গেছি তাকে সত্যের কাছাকাছি। জেনেছি অপেক্ষার মানে কি, অনুভব করেছি অপেক্ষার তীব্রতা, দেখেছি অপেক্ষার শুভ্রতা। আমিও সেই সাথে অনুধাবন করেছি অপেক্ষার নামই জীবন, অপেক্ষার নামই আশা আর অপেক্ষার নামই ভালোবাসা।

আমার লেখা পড়ে আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেন আচ্ছা, আপনার লেখার চরিত্রগুলো কোথা থেকে আসে? আমি হাসি, আর বলি, ওরা কেউ আলাদা নয়, ওরা হয়তো আমারই মনের প্রতিচ্ছবি, ওরা হয়তো আমারই আশেপাশে থাকা মানুষ। ওরা বাস করে আমারই মনের এক একটি কুঠুরিতে। যখন কলমে আঁচড় কাটি, আমার কলমের ছোঁয়ায় ওরা মিলে মিশে এক হয়ে যায়। তখন ওদের আর আলাদা কোনো পরিচয় থাকে না। ওরা কেবলই আমার ভাবনা। ওরা আমারই খণ্ডিত অংশ।

অবশেষে বলতে চাই, জীবনে যে কখনো না কখনো খুব কাঙ্ক্ষিত কারো জন্য বা কোনো কিছুর জন্য অপেক্ষায় থেকেছেন এটা তারই গল্প। অপেক্ষার শেষ কবে হবে তাই ভেবে কেউ অপেক্ষায় থাকে না। অপেক্ষা নিজেই প্রাপ্তির আনন্দ সৃষ্টি করতে পারে। আর তাই তমালিকা আর শুভর মতো আমিও অপেক্ষায় আছি সেই সুবর্ণ ক্ষণের, যখন আকাশ হবে নীল, নামবে ঘন আঁধার আর আমার হৃদয় হবে আলোয় উদ্ভাসিত।

ফাহমিদা চৌধূরী
১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০

এক

দীর্ঘ সময় ইজি চেয়ারে বসে থেকে থেকে হাঁফ ধরে গেল তমালিকার। এই মুহূর্তে তার যেন কিছুই ভালো লাগছে না। চেয়ারের পাশে রাখা সাইড টেবিলটাতে দুলছে একটা পেন্ডুলাম। আনমনে সেই দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর, পায়ের নিচে বিছানো পুরু কার্পেটে পা ডুবিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে ঘর ছেড়ে বাইরে এলো। তার শোবার ঘরের সামনে রয়েছে বিশাল বড় একটা বারান্দা, যার অর্ধেকটা ঘাসে ঢাকা, বাকিটা ফাঁকা। বিশ তলার উপরে তাদের ডুপ্লেক্স বাড়ি, বিলাস ব্যসনে পরিপূর্ণ। অর্থ ও বিত্তের পাল্লায় তাদের ধারে কাছে আসে এমন মানুষের সংখ্যা খুব কমই আছে এই শহরে। সবার উপরে থাকবার ইচ্ছা থেকেই হয়তো এই বিশতলা ভবনে থাকবার ইচ্ছা তাদের।

আক্ষরিক অর্থেই কোনো কিছুরই অভাব নেই তমালিকার। টাকার সাগরে ভাসতে ভাসতে সে বড় হয়েছে। তারপর প্রেম করে বিয়ে করেছে। শ্বশুর, তমালিকার বাবার সিনিয়র কলিগ। সেখানে অর্থ আর বিত্ত যেন আরও সীমাহীন। বিলাসিতা! সে যেন আকাশ ছোঁয়া।

তমালিকাকে সবাই ভালোবাসে। ভালোবেসে তাকে সবাই তমা বলেই ডাকে। সকলের ভালোবাসায় ডুবে থাকা তমার জীবনটা যেন একটা সিনেমার গল্প। সে আজ থাকে অস্ট্রেলিয়ায়, তো কাল ইউরোপে। আজ সমুদ্রে তো কাল পাহাড়ে। জীবনে যেন তার রোজ হানিমুন। রণ, মানে রণক, তার স্বামী, যেন সিনেমার হিরো। জীবনটা তাদের এত বেশি রোমান্টিক আর গোছানো যে মাঝে মাঝে তমার গা জ্বালা করে। বেশি মিষ্টিতে যেমন মুখ তেতো হয়ে যায়, তেমন। শুধু রণ নয়, তার আশেপাশে অন্য সবাইও যেন কোন এক ভিনগ্রহের বাসিন্দা। সবসময় তারা সবাই এমন ভাব করে, যেন তাদের জীবনে অসুন্দর বলে কিছু নেই। সবাই টিভি সিরিয়ালের চরিত্রের মতো। সবসময় সেজে গুজে থাকে। নাটক করে কথা বলে। সামান্য সামান্য ব্যাপারে বড় বড় পার্টি দেয়। অল্প দুঃখে কেঁদে বুক ভাসায়। অথচ, ভীষণ বড় বড় দুঃখ আর অপমান যেন তাদেরকে ছুঁতেও পারে না। সেই সব দুঃখ

আর অপমান যেন তারা দেখেও দেখে না। এসব ভাবতে ভাবতে তমার অস্বস্থিটা যেন ক্রমশ আরও বেড়ে যাচ্ছে। সে দ্রুত দম নিতে থাকে। তার মনের ভেতরের বিরক্তিটা সে যেন কিছুতেই চেপে রাখতে পারছে না।

এখানে, মানে তার সমাজে কে কার থেকে বড়ো, তাই দেখানোর প্রতিযোগিতাই যেন চলছে সারাক্ষণ। বিভিন্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে তমার শ্বশুর বাড়ি থেকে গাড়ি ভরে খাবার আসে তাদের বাড়িতে। সেই খাবার দেখে তমার মা যার পর নাই খুশি হয়। ফিরতি কিস্তিতে সেও খাবার পাঠায় দুই গাড়ি ভরে। তমা জানে তাদের সমাজের পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে একটা শব্দ আছে, সে শব্দকে অবহেলা করে এমন সাহস তাদের কারোরই নেই। এই খাবার পাঠানো আর তার জাঁকজমক এ সবই হচ্ছে সেই পাওয়ার ফ্যাক্টর এর অনুষঙ্গ। একসময় তমারও এসব ভালো লাগত। কিন্তু ইদানীং, কেমন যেন এক ক্লান্তি বাসা বেধেছে তার মনে। বেশ কিছুদিন ধরেই তমা অনুভব করছে, তার জীবন যেন আর আগের মতো নেই। জীবন যেন তাকে পাত্তা না দিয়ে ধাবমান রেলগাড়ির মতো দ্রুত ছুটে চলে যাচ্ছে। তমার মনে হয় সবকিছু পেছনে ফেলে চলে যাওয়াই যেন তার জীবনের মূল মন্ত্র। চোখের পলকে স্টেশন পার হয়ে যাচ্ছে। আর সে, নতুন স্টেশন দেখার আনন্দে বিভোর হচ্ছে, তারপর তাকেও ফেলে সামনে চলে যাচ্ছে। কোথাওই সে থিতু হতে পারছে না। জীবনের এই ম্যারাথন রেসে পরে, ক্রমশই হাঁপিয়ে উঠছে সে। এই ছুটে চলা তার আর ভালো লাগছে না।

তমা এখন জীবন চায়। জীবনের মানে জানতে চায়। নিজেকে নিয়ে ভাবতে চায়। দুঃখ কি? তা সে বুঝতে চায়। সুখের অনুভূতিকে সে ধারণ করতে চায়। দেড়শ-দুইশ পদের বুফে, এখন তার আর ভালো লাগে না। খুব পছন্দের একটি তরকারি দিয়ে সে পেট ভরে খেতে চায়। খুব পছন্দের একটি ড্রেস সে বারবার পড়তে চায়।

এই রকম এলোমেলো কথা ভাবতে ভাবতেই তমা খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়াল। মনের ভেতরে ঘুর পাক খাচ্ছে তার বান্ধবী রিয়ার বলা কথাগুলো। গভীর ভাবনায় ডুবে আছে তমা। সকালে রিয়ার ফোনেই ঘুম ভেঙেছে তার। কোন ভূমিকা ছাড়াই রিয়া তাকে বলেছিল, আমি সুইসাইড করব জানিস। তমা ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বলেছিল সুইসাইড, তা এখনই কেন? সন্ধ্যায় করিস। এখন ঘুমাতে দে। বলেই ফোন কেটে দিয়েছিল। কয়েক সেকেন্ড পরে আবার ফোন বাজল। ফোন তুলে হ্যালো বলতেই আবার সেই কথা, আমি সুইসাইড করব ঠিক করেছি আর তুই ঘুমাচ্ছিস।

তোদের কাছে আমার কোন দামই নেই। এই এখন যদি তুই আমার কথা না শুনিস তাহলে রিসিভার হাতে নিয়েই সুইসাইড করে ফেলব বলছি। তমা ততক্ষণে খানিকটা ধাতস্ত হয়েছে। রিয়ার কান্না আর ধমকিতে ততক্ষণে তার ঘুম হাওয়া হয়ে গেছে। তাই অগত্যা ফোন কানে ধরে তাকে শুনতে হলো রিয়ার উপাখ্যান। দীর্ঘ সময় রিয়ার কান্না, অভিমান আর ধমকি ধামকি শুনে সে বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছে।

রিয়া বলছে সে সুইসাইড করবে। কিন্তু কেন? কি কারণ? কারণ হলো, এই জীবনের নাকি আর কোনো অর্থ নেই তার কাছে। তমা জানতে চেয়েছিল কি এমন হলো যে একেবারে সুইসাইড পর্যন্ত চলে গেলি? উত্তরে রিয়া বলেছে, সে নাকি কাল সকালে খুব সুন্দর করে সেজেছিল কিন্তু তার বর সেলিম সেটা লক্ষই করে নাই। তাড়াহুড়ো করে সে অফিসে চলে গেল। এ অপমান উপেক্ষা করে, দুপুরে রিয়া সেলিমকে ফোন করে জানতে চেয়েছিল, সকালে তাকে কেমন দেখাচ্ছিল। সেলিম বলল, সকালে তোমাকে দেখেছি নাকি যে বলব। রিয়া ভাবল সেলিম দুষ্টামি করছে, তাই দমে না গিয়ে বলল, আমি তো লিভিং রুমেই ছিলাম। বুক শেলফটার পাশে দাঁড়িয়ে। সেলিম নাকি তখন যার পর নাই অবাক হয়ে বলেছে, ও তাই নাকি? তুমি ছিলে সেখানে? আমি তো ভেবেছিলাম তুমি ঘুমিয়ে আছ। সেলিমের কথায় রিয়া হতভম্ব। সে কি একটা ফার্নিচার নাকি যে একটা মানুষ তাকে লক্ষই করবে না। রিয়া পুরো একদিন এই নিয়ে ভেবেছে। তারপর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেলিমের এই উপেক্ষা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না।

এমনিতে রিয়া কখনোই সকালে উঠে না। বেলা দশটা পর্যন্ত সে ঘুমিয়েই থাকে। তা না হলে তার চোখের নিচে কাল দাগ পরে। সেলিম তাকে কখনোই জাগায় না। সৌন্দর্য সচেতন রিয়াকে সে ভালো করেই জানে। একদিন সকালে উঠলে আগামী দশ দিনেও তার ঘাটতি পূরণ হবে না । উপরন্তু পার্লার আর আই ট্রিটমেন্ট নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে যাবে যে খাওয়ার কথাও তার মনে থাকবে না। অন্যদিকে সেলিম একদমই রিয়ার বিপরীত। সে নিজে কখনোই সকালে দেরি করে ওঠে না। সূর্যের আলো ফোটার সাথে সাথে সে বিছানা ছাড়ে। জগিং করে, শাওয়ার নেয় তারপর তার নিজের মতো করে ব্রেকফাস্ট সেরে অফিসে চলে যায়।

গতকাল বরকে চমকে দেবে বলে ঘড়িতে অ্যালার্ম সেট করে রিয়া সকাল সকাল উঠেছিল। অনেকটা সময় নিয়ে সেজেও ছিল। তার এই কষ্টের

কিনা এই প্রতিদান। লিভিং রুমে বসে নেইল পলিশ ঠিক করতে করতে সে দেখতে পেল সেলিমের গাড়ি স্টার্ট নিয়েছে। যতক্ষণে সে উঠে দাড়িয়েছে ততক্ষণে সেলিমের গাড়ি লন পেরিয়ে গেছে। সে ভাবল সেলিম হয়তো ফোন করে সরি বলবে। বলবে তার জরুরি মিটিং আছে। কিন্তু সারাদিন অপেক্ষা করেও সেরকম কিছু হলো না। ফোন এলো না। সন্ধ্যায় যখন সেলিম বাসায় এলো রিয়া তার মধ্যে অনুশোচনার কোনো ছিটে ফোটাও দেখতে পেল না। এ অপমান রিয়া কিছুতেই মেনে নেবে না। কাল সারাদিন সারা রাত ভেবে তারপর সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, তাকে সুইসাইড করতে হবে। এ ছাড়া সেলিমকে শিক্ষা দেওয়ার আর কোনো উপায় আপাতত পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু এখন সমস্যা হচ্ছে তার টমিকে নিয়ে। রিয়া মরে গেলে টমিকে কে দেখবে? টমি তার হাতে ছাড়া খায় না। তার সাথে ছাড়া ঘুড়তে গেলে মজাও পায় না। সবচেয়ে বড় কথা সেলিম টমি কে খুব একটা পছন্দ করে না। কুকুরে তার অ্যালার্জি। রিয়া মনে করে এটা তার বরের মিডিল ক্লাস মেন্টালিটি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই সে সিধান্ত নিয়েছে যত দিন টমির কোন ব্যবস্থা না হচ্ছে, সে কিছুতেই সুইসাইড করবে না। এই সবই তমা মন দিয়ে শুনেছে। রিয়াকে সে কিছুই বলে নাই, কারণ বলার মতো কিছুই সে খুজে পায় নাই। এখন কথাগুলো তার মাথায় যন্ত্রণা হয়ে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। বারান্দার রেলিং এ হেলান দিতে দিতে বেশ খানিকটা বিরক্তি নিয়ে তমা বলে উঠল 'রাবিশ'।

রিয়ার বর সেলিমকে তমা খুব ভালো করেই চিনে। বলা যায়, তাকে সে অনেকটা বেশিই জানে। তারা ক্লাসমেট ছিল। সেলিম মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। লেখা পড়ায় ভালো। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়েই রিয়া তার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিল। সেলিম ছিল ধীর স্থির। সে রিয়াকে ভালোবাসলেও তার জন্য সে পাগল হয়নি। তাদের দুজনের পরিবারের মধ্যে সম্পদের যে বিস্তর ব্যাবধান তা তার ভালোই জানা ছিল। তাই সে চায়নি এই তেল আর জলকে কখনো এক সাথে মেশাতে। কিন্তু বাধ সাধল রিয়া। সেলিমকে পাবার জন্য এমন কিছু নাই যা রিয়া তখন করে নাই। তার নিজের হাত কেটে সেলিমের নাম লিখেছিল, ঘুমের ওষুধ খেয়েছিল। আর শেষবেলায় বাড়ি ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। না সেলিম তাকে নিয়ে পালিয়ে যায়নি, বরং তাকে সে বুঝিয়ে শুনিয়ে তার বাবার বাসায় ফিরিয়ে এনেছিল। রিয়ার গয়না ভর্তি বাক্স সে নিজে হাতে আলমারিতে রেখে তার চাবি রিয়ার মায়ের হাতে গুঁজে দিয়েছিল। কিন্তু তাতে রিয়ার পাগলামি বিন্দু মাত্র কমে

নাই, বরং আরও বেড়েছিল। অবশেষে রিয়ার কাছে সেলিমকে হার মানতেই হলো। সেলিম তাকে বিয়ে করেছিল। রিয়ার ওই সব পাগলামির জন্যই তার বাবা-মাও শেষ পর্যন্ত তাদের বিয়েটা মেনে নিয়েছিল। তাছাড়া এই সময়ের মধ্যে তারা সেলিমকে পছন্দ করে ফেলছিল। সমস্যা শুধু একটাই, সেলিমের টাকা নেই। তা সেটাও খুব সহজেই সমাধান হতে পারে যদি সেলিম তাদের টাকা গ্রহণ করে, তাদের ব্যাবসা দেখাশোনা করে।

সেলিম কিন্তু এই প্রসেসে সহজে ধরা দিলো না। তার মধ্যে নিজে নিজে কিছু একটা করার ইচ্ছা ছিল প্রবল। তাই রিয়ার চাপাচাপিতে, শ্বশুরের টাকা নিয়ে সে একটা ব্যাবসা শুরু করেছে বটে, তবে সে সেটাকে ধার মনে করে। দুই বছরের মধ্যে সে সেই ধার শোধ করার প্ল্যান করেছে। দিনরাত এক করে সে খেটে যাচ্ছে তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য। সেলিমের এই সব কাণ্ড দেখে রিয়া আর তার বন্ধু-বান্ধবরা সেলিমকে 'ম্যান অফ ইগো' 'কর্ম ইয়োগী' এই জাতীয় নানান শব্দে ভূষিত করতে ছাড়ে না। তাকে বোকার দলে ফেলতেও তারা পিছপা হয় না। রিয়া বলে, দেখ তমা আমাদের এত টাকা, এই সব কে খাবে বলত? বাবার সবই তো আমাদের। আমি তো ভেবেই পাই না, কোথায় কীভাবে আমি টাকা খরচ করব। এর মধ্যে সেলিমের আবার নতুন করে টাকা কামানোর কি দরকার? ও একটা বোকা, সিলি মিডিল ক্লাস ম্যান। রিয়ার এসব কথায় সেলিম মোটেও বিচলিত নয়। সে তার নিজের কাজেই মগ্ন থাকে সারাক্ষণ।

তমাও রিয়ার মতো মাঝে মাঝে সেলিমকে বেশ খানিকটা বোকা ভেবেছে। শ্বশুরের এত অঢেল টাকা থাকার পরও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য কেউ এত কষ্ট করে নাকি। তার ওপরে রিয়া একমাত্র মেয়ে। বাবার সব সম্পদের একমাত্র অধিকারী সে একাই। সুযোগ পেলে এই নিয়ে তমাও কম বেশি খোঁচা দিতে ছাড়েনি। কিন্তু আজ কেন জানি সেলিমকে তমার অন্যরকম মনে হতে লাগল। তমার মনে হলো মানুষের আসল শক্তি হচ্ছে তার কর্ম। আজ প্রথম তমার মনে হলো সেলিমই সঠিক পথে আছে, রিয়া নয়। তমার মনে হলো সে রিয়াকে বলে, রিয়া তুই কেবলই সেলিমকে ভুল বুঝেছিস। ভুল পথে টেনেছিস। কারো জন্য আসল ভালোবাসা হচ্ছে তাকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা। সাহায্যের নামে তাকে দাবিয়ে রাখা নয়।

তমা নিজের মনেই একটু হাসল, কারণ সে জানে রিয়াকে এসব কথা বলা অর্থহীন। সে এসবের ধার ধারে না। তাকে এই জাতীয় কিছু বললে সে তৎক্ষণাৎ বলে উঠবে, প্লিজ তমা এই সব ফিল্মি ডায়লগ দিবি না তো,

ভাল্লাগেনা। অথচ এই রিয়াই আবার সেলিমকে দেখতে চায় শাহরুখ খানের মতো, সুপারম্যানের মতো। সে যেন সারাক্ষণ রোমান্সে ডুবে থাকা নায়ক, যে কিনা মাটি কাটতে কাটতে রিয়াকে ভালোবাসবে, খুন করতে করতে রিয়াকে ভালোবাসবে। টাইটানিকের নায়কের মতো পানিতে ডুবে যেতে যেতেও রিয়াকে ভালোবাসবে। নিজের পায়ে দাঁড়ানোটা রিয়ার কাছে অযথা সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই মাঝে মাঝেই সে কিছু একটা করে সেলিমের ধ্যান ভাঙতে চায়, আর তাতে ব্যর্থ হলে সুইসাইডের ডিসিশন নেয়। আজও তাইই ঘটেছে। ডিসগাসস্টিং।

তমা ভেবে পায় না তারা সবাই এমন কেন? তার বা তার আশেপাশের মানুষের জীবনে আসলে সত্যিকারের কোনো সমস্যা নেই। শাড়ির রঙের সাথে রং মিলিয়ে নেইল পলিশ পাওয়া যাচ্ছে না এটাই তাদের মাথাব্যথার বড় কারণ। কিটি পার্টিতে অন টাইম না পৌঁছুতে পারাটা তাদের জন্য শেইমফুল, অথচ তাদের স্বামী রাতে বাড়ি ফিরল না, তা নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। সবারই অনেক অনেক বন্ধুবান্ধব, আড্ডা পার্টি মৌজ মস্তি এসব চলছেই। তারা পার্টিতে যার তার সাথে নাচবে মিশবে এটা যেন কিছুই নয়। এসব নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুললে, তারা হাসি মুখে বলবে, কাম অন, এত কিছু দেখলে কি জীবনে সুখী হওয়া যায়? জীবনে বাঁচতে হলে অ্যাডভেনচার চাই ডারলিং। খাঁচায় বন্দি হওয়ার নাম জীবন নয়। জীবন হচ্ছে ডানায় ভর দিয়ে উড়ে বেড়ানো। মানুষ হয়ে বাঁচার জন্য স্বাধীনতা চাই। তমা ভেবে পায় না এর নাম স্বাধীনতা? এর নাম বাঁচা? মাথাটা ঝিমঝিম করতে থাকে তার। বিড় বিড় করে সে বলে, 'রিডিকুলাস'!

বেশ খানিকটা বিরক্তি নিয়ে ঘরে ফিরে এলো তমা। তারপর ড্রেস চেঞ্জ করল। আজ যা ঘটছে তা নতুন নয় তার জীবনে। বেশ কিছুদিন ধরেই তমা গভীর এক বিষণ্নতার সাগরে ডুবে আছে। তার মনে হচ্ছে কোন এক অদৃশ্য হাত যেন তাকে, তার চেনা পরিবেশ থেকে তুলে, খুব সন্তর্পণে অন্য এক জায়গায় রেখে দিয়েছে। ক্রমশ তার চারপাশের চেনা মুখগুলো যেন অচেনা হয়ে যাচ্ছে। এতদিনের ভালো লাগার অনুভূতিগুলো যেন আজকাল তার অলক্ষ্যেই ক্রমাগত পালটে যাচ্ছে। তমা কিছুতেই সে সবের সাথে তাল মেলাতে পারছে না।

লিফট ধরে নিচে নেমে এলো তমা। পার্কিংয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার সাদা রং এর অডি গাড়িটা। সেটা নিয়েই সে আজ বের হবে। এই অডি গাড়িটা তার খুব প্রিয়। তার বিয়েতে কেউ একজন এটা গিফট করেছে। এই কেউ

একজনটা কে? তমা তা জানে না। সে কেন অডি গাড়ি গিফট করেছে তাও তার অজানা। তার সেটা জানার প্রয়োজনও নেই। এই সব জানবে তার বাবা অথবা তার শ্বশুর। এই সবের হিসাবে তার কি কাজ। তারাই সচল রাখবে তাদের হিসাবের খাতা।

এই সবই হচ্ছে গিভ অ্যান্ড টেক। এতে তমার কোনো ভূমিকা নেই। এসবে তমার কিছুই আসে যায় না। তার কাজ কেবল ভোগ করা। তমার সোসাইটিতে ঠিকমতো টাকা ওড়াতে পারাটাই যোগ্যতা। কোথা থেকে সেই টাকা আসছে তা তাদের কখনোই জানতে হয় না। টাকা ভুতে জোগায়। সেই ছোটোবেলা থেকেই তমা এই কথাটা জানে। সে জানে তার বাবা এবং তার বাবার মতো যারা, তাদের সকলের কাছে একটি করে আলাদিনের চেরাগ আছে। আর এই চেরাগ হচ্ছে তাদের চাকরি। তাতে ইচ্ছে মতো ঘষা দিলেই সবকিছু পাওয়া যায়। ইচ্ছে হওয়া, আর পাওয়া। এর বাইড়ে আর কিছু নেই। ন্যায়-অন্যায় নেই। পাপ-পুন্য নেই। হালাল-হারাম নেই।

ভাবতে ভাবতেই তমা গাড়ির সামনে এলো। ড্রাইভার দরজা খুলে পাশে সরে দাঁড়াল। তমা সেই দরজা দিয়ে ভেতরে না গিয়ে, ড্রাইভারকে ড্রাইভিং সিটের দরজা খুলতে বলল। তার হাত থেকে গাড়ির চাবি নিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসল। মাঝে মাঝে সে নিজে গাড়ি ড্রাইভ করে। নিজের ইচ্ছামতো এলোমেলো ঘুরে বেড়ায়। আজ তার সেই রকমই ইচ্ছা হলো। তাই সে নিজেই গাড়ি নিয়ে বের হলো। ড্রাইভারও তমার এই স্বভাবটা জানে, তাই সে কিছু না বলে নিরবে দাঁড়িয়ে রইল।

গাড়ি চলছে তার গতিতে। বেশ কিছুক্ষণ গাড়ি চালানোর পর তমা খেয়াল করল, তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে এক বিশাল খোলা প্রান্তর। বর্ষাকাল তাই সেখানে পানি থইথই করছে। মনে হচ্ছে, যেন একটা সাগর। সেই বিশাল পানির বুকে কোনো ঢেউ নেই, কোনো আলোড়ন নেই। স্থির হয়ে আছে, যেন কোনো তপস্বী। ঠিক যেন তমারই মনের প্রতিচ্ছবি। কোনো আন্দোলন নেই, শিহরণ নেই। নেই কোনো টানাপোড়ন। যেন অপেক্ষা করে আছে হঠাৎ কেঁপে ওঠার জন্য।

পানির কাছাকাছি এসে তমা গাড়ি থামাল, তারপর গাড়ি থেকে নেমে এলো। হাঁটতে হাঁটতে সে চলে এলো পানির খুব কাছে। বিশাল এক অশ্বত্থের নিচে এসে দাঁড়াল সে। গাছে গুড়িটা পানিতে ডুবে আছে। গাছটা মনে হয় একসময় শুকনো মাটিতেই ছিল। এখন বর্ষা, তাই পানি গ্রাস করেছে তার ভূমি। তমা আর একটু সামনে এগিয়ে গেল। ভেসে থাকা

গাছের গুঁড়িতে বসল। বসে থেকে থেকে তার মনে প্রশ্ন জাগল, তার এই অর্থহীন জীবনের কি কোনো মানে আছে? যদি কোনো মানে নাই থাকে, তাহলে খামোখা তাকে বয়ে বেড়ানোতে কি লাভ?

বিষণ্ন মন নিয়ে তমা ভাবতে থাকে, তার জীবনে কোনো ছন্দ নেই। তার কোনো চাওয়া নেই, কোনো লক্ষ্য নেই। তার জীবনে এখন আর কোনো লাভ লোকসানের হিসাবের খাতা নেই। সবই যেন শূন্য। এ সব ভাবতে ভাবতেই তমার মনে হলো, কিছুই যদি নেই, তাহলে এই জীবনটাইবা কেন? তার এই জীবনের শেষ হওয়া প্রয়োজন। সে যেন চলতে চলতে হাপিয়ে উঠেছে। সামনে পেছনে কোনো দিকেই যেন তার আর যাওয়ার উপায় নেই। জীবনে সব কিছুই আছে তবু যেন কিছু একটা নেই। তার কেবলই মনে হয় সে যেন কিছু একটা চায়। কিছু একটার জন্য সে অপেক্ষায় আছে। কিন্তু সেই কিছুটা কী? তমা তা কিছুতেই বুঝতে পারছে না। কীসের জন্য তার এই অপেক্ষা তাও তার কাছে অজানা।

এই সব ভাবতে ভাবতে, মনের অজান্তেই সে পানির ওপরে ঝুঁকে পড়ল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে সেই পানিতে অদৃশ্য কিছু খোজার ব্যর্থ চেষ্টা করতে থাকল। পানি ওপরে ভেসে ওঠা নিজের ছায়াটাকে সে বার বার কাটাকুটি করার চেষ্টা করতে থাকল। ঠিক এই সময়ে তার পাশ থেকে একটি পুরুষ কণ্ঠ বলে উঠল, কি হলো তোমার? সুইসাইড করবে নাকি?

হঠাৎ এই অনাকাঙ্ক্ষিত কণ্ঠ শুনে কেঁপে উঠল তমা। খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে সে ভাবল, এই রকম নির্জন জায়গায় কে কথা বলে? ঠিক তখনই কণ্ঠটি আবার বলল, সুইসাইডের জন্য এটা মোটেও ভালো জায়গা না। আপাতদৃষ্টিতে দেখে মনে হচ্ছে এখানে অনেক পানি, আসলে তা নয়। এখানে হাঁটু জলও নেই। ঝাঁপ দিলে কেবল জামাকাপড়ই ভিজবে, আর কিছু হবে না।

কে কথা বলছে, কেন কথা বলছে তা নিয়ে তমা মোটেও মাথা ঘামাল না। কথা বলাটা বাস্তব না অবাস্তব সে সব চিন্তা বাদ দিয়ে, পানির দিকে তাকিয়ে থেকেই খানিকটা ঝাঁজের সাথে বিদ্রুপ মাখানো কণ্ঠে তমা বলল, কেন? আমি মরতে যাব কেন? এখানে আমি বেড়াতে এসেছি। বেড়াব, ঘুরব, তারপর বাড়ি যাব।

ছেলে কণ্ঠটি বলল, তা বেশ, বুঝলাম, সুইসাইড কেস নয়। তাহলে কেসটা কি বলত?

এই যান্ত্রিক কণ্ঠে এমন প্রশ্ন শুনে সে যেন একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেল। আর সেই মুহূর্তে তমার ভীষণ মন খারাপ হলো। তারপর প্রায় শোনা

যায় না এই রকম কণ্ঠে সে বলল, সে তো আমিও জানি না। সবই আছে আমার, তবু মনে হয় কিছুই যেন নেই। হাতে অফুরন্ত সময়, তবু মনে হয় একদম যেন সময় নেই। তেমন কোনো কাজ নেই আমার, অথচ ভেতর থেকে কি যেন করার তাড়া সারাক্ষণ যন্ত্রণা দিচ্ছে আমাকে। আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

কণ্ঠ: তোমার করার কিছুই নেই বলছ। জীবনে তাহলে অনেক কিছুই করেছ? কি বলো?

তমা: নাহ্! সেটাও সত্য নয়। বলবার মতো তেমন কিছু তো করিনি জীবনে, তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু তো নেই। যা কিছু আছে তার সবই মনে হচ্ছে অর্থহীন আর অসম্পূর্ণ।

এই পর্যন্ত বলেই তমা থামল। চুপ করে বসে রইল। সময় গড়াতে থাকল। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে কণ্ঠ বলে উঠল, সেই তখন থেকে একা একা কি এত ভাবছ বলত?

তমা: (বিরক্ত মাখা কণ্ঠে বলল) আচ্ছা মানুষের কি খেয়েদেয়ে কোনো কাজ নেই। খালি খালি অন্যের কাজে নাক গলায়। দেখছো যে আমি একা থাকতে চাইছি। এতদূর এসে একা একা বসে আছি। সেই সব না বুঝে কেবল বকেই যাচ্ছ, বকেই যাচ্ছ।

এতটা রাগ আর উষ্মা তমা কাকে দেখাল, তা সে একবারও ভাবলো না। ভাবার কথা তার মনেই এলো না। ওদিকে তমার এই রাগে কণ্ঠটি একটুও বিচলিত হলো না। বরং কৌতুক মেশানো সুরে সে বলল, হুম! আমি মানুষ হলে তাই হয়তো বলা যেত। কিন্তু আমি তো মানুষ নই।

এ কথা শুনে তমা চমকে উঠল। বলল, মানে? তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে সে আবার বলল, এর মানে কি? তমা আরো ভাল করে তার চারপাশ দেখলো। কোথাও কেউ নেই। নিরবিচ্ছিন্ন শূন্যতা খাঁখাঁ করছে চারপাশ। তমার মন খারাপ হয়ে গেল। তার মনে হলো, হয়তো তার মাথাটাই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। পাগল হবার পূর্ব লক্ষণ। কণ্ঠটা ভূতটুতও হতে পারে। মরে গিয়ে হয়তো তারই মতো একা হয়ে গিয়ে এখানে বসে আছে। আর এইখানে তমাকে দেখে তার একাকিত্বের যন্ত্রণা লাঘব করতে এসেছে।

তমা একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তারপর আবার সে নিজের মনের ভেতরে ডুব দিল। ভূত হলেই বা ক্ষতি কি? ভূত হচ্ছে মানুষের ছায়া। আর এই